রাত্রির রঁদেভু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রাত্রির রঁদেভু

সূচিপত্র

আমায় সে চিনেছিল? বলো, বলো ২১৯, যারা হারিয়ে গেছে ২১৯, বর্ষণমালা ২২০, অলীক মানুষের সন্তান ২২২, সাঁকোটা দুলছে ২২৩, অভিসার ২২৫, নির্মাণ খেলা: দুই ২২৫, রাত্রির রঁদেভু ২২৭, বলে দিতে পারি স্পষ্ট ভাষায় ২২৭, কবিতা গদ্য ২২৮, এক বিরহী ও অন্ধকারের গান ২৩০, ঝড় বৃষ্টির এমন হুল্লোড় ২৩১, একটি পাতা খসা ২৩১, তুমি ২৩২, এক জীবনে ২৩৩, ব্যক্তিগত ইতিহাস ২৩৩, হায়, ধর্ম! ২৩৪, একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা ২৩৮, জলকে ভয় কি, ভয় তো শুধুই জল ২৩৮, তোমার হাত ২৩৯, সময়ের চিহ্নগুলি সময় মানে না ২৪০, নিজস্ব ভাষা ২৪১, মুহূর্তের অস্থিরতা ২৪২, সাঁজোয়া গাড়ির সামনের দিকে ২৪২, আমাকে যেতে হবে ২৪৪, একবার বুক খালি করে বলো ২৪৫, লাল ধুলোর রাস্তা ২৪৫, কোথায় আমার দেশ ২৪৬, এ জন্মের উপহার ২৪৭, ভুল স্টেশানে ২৪৭, তিনটি প্রশ্ন ২৪৮, বুকের কাছে ২৪৯, নির্মাণ খেলা তিন ২৫০, স্টিফেন হকিং-এর প্রতি ২৫১, এক পলক অতীত ২৫২, শিল্প নয়, তোমাকে চাই ২৫৩, আমার আমি ২৫৪, ছেলে মেয়েদের গল্প ২৫৫, নিজস্ব বৃত্তে ২৫৬, এইভাবেই প্রতিদিন ২৫৬, এক বনমানুষ ২৫৭, এত চেনা ২৫৮, চলে যাবো? ২৫৮, নন্দনকাননে দ্রৌপদী ২৫৯

আমায় সে চিনেছিল ? বলো, বলো

একবার চোখে চোখ, তারপর দু' দিকের পথ
আমায় সে চিনেছিল ? কিংবা সে দেখেছিল আড়ালে কারুকে ?
তাতে কিছু আসে যায় ? কথা নেই, দু'জনে দু'দিকে চলে যাওয়া
পেছনে ফিরিনি আর, আমার রাস্তায় কত বাঁক
দু' চারটে খানাখন্দ, জল-কাদায় কুচিকুচি আলো
জুতোয় কাঁকর ফুটছে, একা সিগারেট কিন্তু দেশলাই কোথায়
আমায় সে চিনেছিল ? চোখে চোখ, ছিল কোনো ভাষা ?
এক হোঁচট, টর্চ নেই, অলীক শরীর যায়, আসে
আমায় সে চিনেছিল ? আমাকে, না সে কাকে দেখেছে ?
শুয়ারকা বাচ্চা সব, কালো কুত্তা, হঠ যাও, মারবো এক লাথ
বন্ধ সব দোকানের তালাগুলো ভেঙে দেবো একেক ধাক্কায়
আমায় সে চিনেছিল ? বাতাসের ঘূর্ণি থেমে গেছে
আকাশে ইয়ার্কি বুঝি, এত তারা, উপড়ে নেবো সব
আমায় সে চিনেছিল ? বলো, বলো, সে কোথায় গেল ?
অন্ধকার বাড়িগুলি, সব জানলা পোড়াবো ফুৎকারে
এ বিশ্ব উচ্ছন্নে যাক, অমরত্ব মূর্খের রটনা
করতলে ধরে রাখা জল, তার খেলা, সেই দর্পণে জীবন
আমায় সে চিনেছিল ? বলো, বলো, কার চোখে চোখ ?

যারা হারিয়ে গেছে

'বেণুবনে' বয়ে গেল হিল্লোল, আমি শুনতে পেলুম বাঁশঝাড়ে
শরশর আওয়াজ
আহা 'দখিনা পবন' তুমি এত স্নিগ্ধতা দিলে এই বিকেলে
কিন্তু কবিতায় আর কোনোদিন তোমার বন্দনা করতে পারবো না
তুমি থেকে যাবে রবীন্দ্রনাথের গানে
এখন কি আর কেউ 'বিরলে রোদন' করে না ?
দেখতে পাই না, ভাষাও তাকে ভুলে যাচ্ছে
'ওলো সই, ওলো সই', সমস্ত মনের কথা শেষ হয়ে গেছে
পঞ্চাশ বছর আগে
কোথায় হারিয়ে গেলে 'বাতায়ন' ?

‘গবাক্ষে’র আড়ালেও কেউ থাকে না ব্যাকুল প্রতীক্ষায়
‘সকরুণ বেণু’ আর বাজবে না কোনোদিন
তবুও আমি এক একবার পেছন ফিরে
খুব তীব্র ভাবে ফিরিয়ে আনতে চাই
‘মম’ ও ‘মুই’-কে
কিন্তু কলম মানতে চায় না
কলমও তো আর ‘লেখনী’ নেই যে !

বর্ষণমালা

১

এক পশলা বৃষ্টি খেয়ে বেড়াতে বেরুলো ছটফটে
কিশোরী নদীটি
সরল কদমগাছের দিকে চোখ টিপে বললো, যাবি ?
আকাশ একটু একটু করে নেমে আসছে, আবার উঠছে
আবার নামছে
কলাগাছের ছেঁড়া পাতায় কে যেন বাজাচ্ছে বাঁশি
ও বাঁশিওয়ালা, তুমি একবার ফুরুস ফুলগুলোকে কাঁদাবে না ?
পেঁপেগাছের পিঁপড়ে ঝাঁপ দিল মহাশূন্যে
মাটি থেকে সাত ইঞ্চি উঁচু দিয়ে ঘর্ঘরিয়ে ছুটে
গেল একটা রথ
রাস্তাটা একটু রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো
লিচু গাছের নতুন পাতারা পায়ের ধুলো নিচ্ছে
পুরনো পাতাদের
ডানায় পতাকা উড়িয়ে কোঁচ বক নদীটিকে বললো,
চল না কল্যাণেশ্বরীর মেলায়
নিমফুলের মৌমাছি ভুলে গেছে ঘর গেরস্থালির কথা
দিনের আলোয় একটা সাদা প্যাঁচা উড়ে গেল রাত্রির দেশে
তিনটে কাঠচাঁপা বন্দি করে রেখেছে রাজপুত্রের মতন
এক টুকরো রোদ
ও বাঁশিওয়ালা, তুমি একবার তোমার বন্ধুর ঘুম ভাঙাবে না ?

২

সেদিনও ছিল আকাশ ভাঙা বৃষ্টিময় সন্ধে
তোমার বুক মাদক ছিল, মৃদু ঘামের গন্ধ
নরম চাঁদ, দু'খানি চাঁদ, গোলাপি রঙা বৃন্ত
চক্ষে ধাঁধা, জিহ্বা তবু ভুল করেনি চিনতে
এসেছিলে কি নিরাভরণ নদীর মতো তন্বী
বুকে ছিল কি সুধা ? হায়রে ক্ষুধার্তের মন নেই
প্রথম নারী, তোমার চাঁদে আমার সেই স্পর্শ
অমৃত নয়, ঘামের নুন, তাই কেঁপেছি হর্ষে

৩

দৌড়োতে দৌড়োতে লাল মাটির প্রান্তর ভরা
বৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে
বারান্দায় উঠে এলে তুমি
কে সেখানে বসে আছে
বেতের চেয়ারে, ওষ্ঠে সিগারেট
ভেজা শাড়ি লেপ্টে গেছে তোমার বাতাবি-নিতম্বে
সরস্বতী মূর্তির মতন কোমর
নাভিতে মেঘের ঘ্রাণ
সেই লোকটির হাতে কলম, কোলে একটি বাঁধানো খাতা
সে হয়তো কবিতা লিখছিল, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল
সাত লক্ষ কল্পনার সুতো
সরস্বতীর বন্দনা ছেড়ে সে দেখছে তোমাকে
তোমার উরুর ডৌল
সমস্ত বৃষ্টিময় দেশ ভরে গেল রভস গন্ধে
সেই পুরুষটির জাদুদণ্ডে জ্বলে উঠলো দাবানল
কলম আর খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে উঠে এলো
তোমার কাছে দয়া চাইছে যেন, আলিঙ্গনে উদ্যত
এক শরীরের নিঃসঙ্গতা অন্য শরীরের নিঃসঙ্গতাকে
গরলের মতো পান করতে চায়
ইতিহাস তখন স্তব্ধ হয়ে থাকে অন্তরীক্ষে
দেবতারা হাততালি দেয়, সন্ন্যাসীরা মুখ নিচু করে কাঁদে
বাঁশিওয়ালা তার বাঁশি বাজিয়ে আরও বৃষ্টিকে ডাকে
কয়েকটা শালিক শুধু দেখে গেল মেঝেতে গড়ানো
সেই না-লেখা কবিতা

৪

বকুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একা
বকুল ফুলের মতন বৃষ্টি, ঝরেছে বকুল, বৃষ্টি বকুল
ঝাপসা বাতাসে একটি ঝলক অচেনা নিজেকে দেখা

৫

বেলা যায়, বেলা যায়, শোনোনি সন্ন্যাসী ?
পাহাড় শিখর থেকে গড়ানো পাথর যেন, ক্ষয়ে আসে দিন
ধারাস্নানে সুষুপ্ত পৃথিবী
খেয়া ঘাটে কেউ নেই, একা একা নৌকোখানি দোলে
ফিরে এসো হে সন্ন্যাসী, তোমার দু' পায়ে এত ক্ষত
আর কত দূর যাবে ? জীবন ফুরিয়ে এলে তবু কোনো
পথ বাকি থাকে ?
জীবনই জীবন-সত্য, তার ওপারে আর-কিছু নেই
ফিরে এসো, হে সন্ন্যাসী, বাসনার মধ্যে ফিরে এসো
সাজ খোলো, ছোট ছোট দুঃখে কাঁদো, শিশুটিকে
কোলে তুলে নাও
ফিরে এসো, হে সন্ন্যাসী, কত ক্ষমা চাওয়া বাকি আছে
জীবন ফুরিয়ে এলো; খেয়াঘাটে নৌকোখানি একা একা দোলে

৬

সুন্দর শুধু ব্যথা দেয়, শুধু বুক মোচড়ায়
সুন্দর নরম ডানায় আগুন ঝরায়
সুন্দর যেন হঠাৎ বৃষ্টি, অলীকের মতো তৃষ্ণা ছড়ায়
সুন্দর চায় গোপন অশ্রু, পূজারীকে পায়ে ঠেলে চলে যায়
সুন্দর আরও সুন্দরতর হয়ে আলেয়ার মতন ঘোরায়

সুন্দর তার নরম ডানায় আগুন ছড়ায়...

অলীক মানুষের সন্তান

যে গ্রামে আমি জন্মেছিলাম, সেই গ্রাম অদৃশ্য হয়ে গেছে
বদলে যায়নি, একেবারেই শূন্যে বিলীন

গাছপালা নেই, পাখির বাসা, নির্জন পুকুর ঘাট, মানুষের কলস্বর
কিছুই নেই
পায়ে চলা পথ নেই, মেঘলা আকাশ নেই
যে তুলসীতলায় নতুন মামিমা অভিমানে চোখের জল ঝরাতেন
সেখানে একটি ঘাসও নেই
যে গ্রামে আমি জন্মেছিলাম, সেই গ্রাম অদৃশ্য হয়ে গেছে
তবে কি আমি কোথাও জন্মাইনি ?
আমার ছেলেকে আমি যখন পড়তে বসাই, তার চোখে
এঁকে দেবার চেষ্টা করি সেই গ্রামের স্বপ্ন
যদি সেও মনে'না রাখে
তা হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে আমার জন্ম
এক অলীক মানুষের সন্তান হয়ে সে কোথায় আশ্রয় খুঁজবে ?

সাঁকোটা দুলছে

মনে পড়ে সেই সুপুরি গাছের সারি
তার পাশে মৃদু জ্যোৎস্না মাখানো গ্রাম
মাটির দেয়ালে গাঁথা আমাদের বাড়ি
ছোট ছোট সুখে সিদ্ধ মনস্কাম ।

পড়শি নদীটি ধনুকের মতো বাঁকা
উরু ডোবা জলে সারাদিন খুনশুটি
বাঁশের সাঁকোটি শিশু শিল্পীর আঁকা
হেলানো বটের ডালে দোল খায় ছুটি ।

এপারে ওপারে ঢিল ছুঁড়ে ডাকাডাকি
ওদিকের গ্রামে রোদ্দুর কিছু বেশি
ছায়া ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যায় ক'টি পাখি
ভরা নৌকায় গান গায় ভিন দেশি ।

আমার বন্ধু আজানের সুরে জাগে
আমার দু'চোখে তখনো স্বপ্নলতা
ভোরের কুসুম ওপারে ফুটেছে আগে

এপারে শিশির পতনের নীরবতা ।

আমার বন্ধু বহু ঝগড়ার সাথী
কথায় কথায় এই ভাব এই আড়ি
মার কাছে গিয়ে পাশাপাশি হাত পাতি
গাব গাছে উঠে সে-হাতেই কাড়াকাড়ি ।

আমার বন্ধু দুনিয়াদারির রাজা
মিথ্যে কথায় জগৎ সভায় সেরা
দোষ না করেও পিঠ পেতে নেয় সাজা
আমি দেখি তার সহাস্য মুখে ফেরা ।

আমাদের ছুটি মন-বদলের খেলা
আমাদের ছুটি অরণ্যে খোঁজাখুঁজি
আমাদের ছুটি হাসি কান্নার বেলা
আমাদের ছুটি ইঙ্গিতে বোঝাবুঝি ।

খেলায় খেলায় জীবন পৃষ্ঠা ওড়ে
খেলায় খেলায় ইতিহাস দেয় উঁকি
এদিকে ওদিকে পৃথিবীর পিঠ পোড়ে
কত না মানুষ ভুরু কুঁচকিয়ে সুখী ।

বন্ধু হারালে দুনিয়াটা খাঁ খাঁ করে
ভেঙে যায় গ্রাম, নদীও শুকনো ধূ ধূ
খেলার বয়েস পেরোলেও একা ঘরে
বার বার দেখি বন্ধুরই মুখ শুধু ।

সাঁকোটির কথা মনে আছে, আনোয়ার ?
এত কিছু গেল, সাঁকোটি এখনো আছে
এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার
সাঁকোটা দুলছে, এই আমি তোর কাছে ।

অভিসার

সরল নির্জন রাস্তা মধ্য রাতের জ্যোৎস্নায়
নদী হয়ে আছে
হঠাৎ ডেকে ওঠে কোকিল
তুমি যেই মুখ তুললে অমনি খসে পড়লো
একটি স্বর্ণ চাঁপা
জলে ভাসছে সেই ফুল, ভিজে যাচ্ছে তোমার খালি পা
তোমার কানের লতির পাশে একটি জোনাকি
তুমি ঢেউ সরিয়ে সরিয়ে হেঁটে আসছো
শিঞ্জিনী নেই, তবু নাচের মতো শব্দ হচ্ছে রিনরিন
আমি বসে আছি পাহাড়-প্রান্তে এক পিপুল গাছের তলায়
তুমি নদী নিয়ে আসছো, স্বর্ণচাঁপা কোকিল আর
জোনাকি নিয়ে আসছো
হ্যাঁ, এটাই সত্যি, আর সব মিথ্যে
আমরা তিনতলার সিঁড়ি ভাঙা লোডশেডিং ঘর মিথ্যে
তোমার ঘুসঘুসে জ্বর, লোহার খাটে শুয়ে থাকা মিথ্যে
চব্বিশ ঘণ্টার হরতাল হচ্ছে কোনো এক অলীক নগরীতে
তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই
আমি বসে আছি পাহাড়-প্রান্তে, তুমি ভেসে এসেছো
জ্যোৎস্নার নদীতে
এই স্পর্ধিত সত্য চিরকালের...

নির্মাণ খেলা : দুই

রতিকৌতুকে দোলে চন্দ্রমা দোলে চন্দ্রমা দোলে
জলে ভেসে আছে খানিক আকাশ খানিক মেঘের ছেঁড়া অবকাশ
রাত্রিবসনা এ কেমন নারী দেবতাকে দেয় নীল তরবারি
বুক পেতে দেয় ঊরু ঝলসায় মায়া সিন্দুক খোলে...

এই চারলাইন লেখার পর আমি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। প্রায় মধ্যরাতে দোতলার জানলা থেকে পুকুরের জলে চাঁদের দোল খাওয়া দেখে কবিতার প্রথম লাইনটি মনে আসে। চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর যাবতীয় জলের যৌন সম্পর্ক। প্রথম লাইনটি সে জন্য স্বাভাবিক। দ্বিতীয় লাইনটিতে অনেক দ্বিধার কাটাকুটি আছে। প্রথমে লিখেছিলাম,

'জলে ঢেউ ওঠে, জলে বিভঙ্গ আকাশের এক কণা'... । তেমন পছন্দ হলো না। ছন্দের চালটা বদলালে মন্দ কী ? দ্বিতীয়বার লেখার পর 'ছেঁড়া অবকাশ' নিয়ে একটু খটকা লেগেছিল, তারপর ভাবলাম, চলুক না !

তৃতীয় লাইনে নীল তরবারির বদলে প্রথমে লিখলাম 'মায়া তরবারি', এটা খুব সহজে প্রথাবাহিত ভাবে আসে। প্রথার ভূত মাথা থেকে তাড়ানো খুব শক্ত। কিন্তু চতুর্থ লাইনে 'মায়া' শব্দটা আমার আবার দরকার। মায়া তরবারির চেয়ে মায়া সিন্দুক অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে, তখনই দেখতে পাই নীল তরবারি।

চাঁদ যখন দেবতা ছিল, তখন যৌন টানের নামই ছিল প্রেম। দেবতারা আসলে প্রেম জানে না। নীল আমর্স্ট্রং-এর পায়ের ধুলো পড়ার পর চাঁদ আর দেবতা নেই। তাছাড়া, এই চার লাইনের মধ্যে আমি কোথায় ? কাটাকুটি করে লাইনগুলি এই ভাবে রূপান্তরিত হয় :

এত শব্দ কেন, দিগন্তে কেন আগুন ?
বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে নেমে গড়িয়ে যায় রক্ত
কারা হঠাৎ হঠাৎ আমার কান ধরে টানে ?
ঘাড় মুচড়ে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেয় মুখ
মানব সভ্যতার মধ্যে কত শতাব্দীর আবর্জনা, এত নোংরা গন্ধ
মধ্যরাতে ঘর ছেড়ে, বাইরে চলে আসি
বুকে ভরে নিশ্বাস নিই, সেই বাতাসে মেশানো অশ্রু
নদীর জলে লুটোপুটি খাচ্ছে চাঁদ, এ যেন বিশ্ববিশ্রুত প্রেম
নিঃশব্দ নিশীথে দোলে হাওয়া
ওরা কিছুই জানে না
বারান্দায় একা বসে সমস্ত শরীর ও শ্বাস উষ্ণ হয়ে ওঠে
সাঙ্ঘাতিক ইচ্ছে করে নদীতে উন্মুক্ত হয়ে নেমে পড়তে
কিন্তু তাকে স্পর্শ করার আগে বারবার প্রশ্ন করি, আমাকে
ভালোবাসবে নদী ?

[এতে ছন্দ নেই, এত গদ্যময় হয়ে গেল রাত। আর লিখতে ইচ্ছে করে না। কলম সরিয়ে রেখে বারবার মনে মনে আওড়াই : রতিকৌতুকে দোলে চন্দ্রমা দোলে চন্দ্রম' দোলে। রতি কৌতুকে দোলে চন্দ্রমা দোলে চন্দ্রমা...]

রাত্রির রঁদেভু

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, বুক মুচড়ে মনে হয় যেন
এই শেষ দেখা
সহসা গোধূলি মেখে মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে ঝাপসা সুদূরে
একটি পাখির শিস মাঝে মাঝে শুনি
কোনোদিন দেখাও হবে না
ধূসর মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি পান্থপাদপের মতো
এইখানে কথা ছিল রাত্রির রঁদেভু
কে কোথায় গেল
ফুলের রেণুর মতো মৃদু ডানা মেলে উড়ে যায় দীর্ঘশ্বাস।

পিঁপড়ের মুখে ধরে রাখা একটি চিনি-বিন্দু, এই যে জীবন
তার স্রোত থেকে কে কখন
নিঃশব্দে তলিয়ে যায়, কিছু অভিমান লেগে থাকে
ইস্কুলের ঘণ্টাধ্বনি, তারও স্রোত অবিস্মরণীয়
তবুও সিঁড়ির মুখে হাত তুলে বলতে ইচ্ছে হয়
যেও না, যেও না, ফিরে এসো
সান্ধ্য সম্মিলনে ফিরে এসো
প্রবাসে বা নিরুদ্দেশে অনেক বসন্তখেলা বাকি রয়ে গেছে
বকুল শাখার নীচে পাতা আছে ফুলের বিছানা...

পান্থপাদপ তো নয়, এ যে একটা বাজের থাপ্পড় খাওয়া গাছ
অন্ধকারে একা মুখ চুন করে আছে
তার হাহাকার শুধু নিজেই সে শোনে :
আমাকেও কি কেউ বলবে, ফিরে এসো, যেও না, যেও না !

বলে দিতে পারি স্পষ্ট ভাষায়

ওরা মেতে আছে কিসের নেশায় জানি না, আমি ছুঁয়ে আছি তোমাকে
ওরা হেসে খেলে বানালো এবং ভাঙলো, গণতন্ত্রের মহিমা
চাকা খুলে মুখ থুবড়ে পড়লো গ্রীস, রোমের দাপট টুকরো
পথের ধুলোয় বসে আছে এক অন্ধ, তাকে ঘিরে আছে মানুষ

তার গান শুনে মন ভরে যায় বিষাদে, আমি ছুটে যাই একলা
সারা সৃষ্টিতে কেউ নেই শুধু তুমি, বন্ধ ঘরের জানলা
অটোমান সাম্রাজ্যের কাছে ধ্বস্ত, একদা ছিল যে দুনিয়া
অস্ত্রের বিভা, জয়ের প্রবল হাস্য, শোষক এবং শোষিত
সবাই নদীর কিনারে গাছের পাতা, গ্রাস করে নেয় প্রকৃতি
অন্ধ গায়ক ধুলোয় জ্বেলেছে আগুন, নোখের ডগায় মন্ত্র
সে-ই শুধু জানে সময় যায় না ফেরানো, সময় তো নয় পোষ্য
ছাই দিয়ে লেখে ভূমির ওপর কবিতা, যে পড়েছে সে-ই জেনেছে
আমি ছুটে যাই দেয়াল বিহীন ঘরের নীরব জানলা খোলাতে
যারা মেতে আছে দরজা ভাঙার খেলায়, রাত্রি শেষের বেলায়
শস্যের ক্ষেত রণভূমি চায় বানাতে, 'আমি' নই, বলে 'আমরা'
তারা থাক যত রঙিন স্বপ্নে মদির, সঙ্গীতহীন বধির
আমি এত ঝড় শেষেও তোমাকে চিনেছি, শেষ নিঃশ্বাসে চেয়েছি
তুমি নও কোনো রূপক অথবা উপমা, কালির আঁচড়ে রচনা
বলে দিতে পারি স্পষ্ট ভাষায় তুমি, রক্ত মাংসে প্রেম।

কবিতা গদ্য

—আত্মপ্রকাশ উপন্যাসখানা লিখতে তোকে কে মাথার দিব্যি
দিয়েছিল, সুনীল ?
হারামজাদা ছেলে, কবিতা লিখছিলি, হঠাৎ গদ্যের দিকে ঢলাঢলি
করতে গেলি কেন ?
ওরে লোভী পামর, তুই দু' কূল খোয়ালি ?
—কে তুমি, কে তুমি কেন আমাকে এমন বকুনি দিচ্ছো, মুখ দেখাও
জানো তো আমি আমি নিয়তিবাদ মানি না
রক্ত মাংসের না হলে গ্রাহ্য করি না দেবী সরস্বতীকেও !
—কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠা ছেড়ে কেন গেলি খবরের কাগজের গদ্যের দিকে
খুব টাকার আহিঙ্কে হয়েছিল, তাই না ?
—টাকা নয়, দু' মুঠো ভাত, তখন প্রায় খেতে পেতাম না
বিদেশ ফেরত এক কাঠ-বেকার
ট্রাম-বাস ভাড়াও থাকতো না, ওয়েলিংটনের মোড় থেকে শ্যামবাজার
পর্যন্ত যেতাম পায়ে হেঁটে
গদ্য তবু মজুরি দেয়, কবিতা যে কিছুই দেয়নি

—কবিতা কিছুই দেয় না ?
—কে তুমি, কে তুমি, মুখ দেখাও !
—বিশ্বাসঘাতক ! গদ্যের বর্ম পরেছিস বলে আজ
উচ্চারণ করতে পারলি, কবিতা কিছুই দেয় না
রক্ত মাংসের সরস্বতীর টুকরো দেয়নি ?
স্বর্গের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মাধুর্য-নিশানের ছোঁয়া পাসনি তখন ?
—ন্যাকামি করো না, ওহে অশরীরী, ওহে মধ্যরাত্রির কণ্ঠস্বর
সরস্বতীর টুকরো, স্বর্গের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এসব ঢপ কথা
বাঁচতে চেয়েছিলাম, শূন্য পকেট, জীবনভরা শূন্যতা, তবু
বাঁচতে চেয়েছিলাম, তুমি কী জানো আমার দুঃখ !
—এগুলোর নাম গদ্য ? লক্ষ্মীছাড়া আঙুল পুড়ে যায়নি কেন তোর ?
—পুড়েছে, আঙুল নেই, রক্তাভ নোখ নেই, আছে শুধু কলম
—আর ?
—সাদা পৃষ্ঠাকে কালো করার প্রতিজ্ঞা
অন্ধের মতন এক সুদীর্ঘ সফর, প্রতিটি দিন অসমাপ্ত
—পেয়েছো কি মধ্য যামে যা ছিল পাবার ?
—বেলাভূমিতে লাল লাল কাঁকড়াগুলো কি সমুদ্রকে পায়
নাকি সমুদ্র শুনতে পায় তার বন্দনাকারীদের ভাঙা গলা ?
জীবন এ রকম
—কবিতা তোমাকে কিছুই দেয়নি ? কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস, কিছু চিঠি
পাটভাঙা জামা, না-ছেঁড়া টেঁকসই জুতো ?
—কেন গদ্য ভাষায় কথা বলছো, ওহে অদৃশ্য যাত্রা দলের বিবেক ?
ট্রাম লাইনের কর্কশ শব্দের মতন গদ্যে ঝঙ্কৃত হচ্ছে প্রেম
সব দিকে গদ্য, কবিতাকে আক্রমণ করছে গদ্য, টিনের চালে
অগভীর চোখ ধাঁধানো রোদ্দুরের মতন গদ্য, তবু তুমি কবিতাকে
আঁকড়ে ধরতে চাও, কে তুমি ?
—আমি রাস্তার একটা বাঁক, তোমার জামার একটা হারানো
বোতাম, সুনীল !
—এখন আমি, রাত একটা চল্লিশে এই যা লিখছি
তা কবিতা না গদ্য ?

এক বিরহী ও অন্ধকারের গান

প্রথমে বন্দনা করি শুদ্ধ অন্ধকার
একা দেখা রূপ যার সহস্র প্রকার !

তুমি বর্ণময়ী, তুমি আকাশ পত্রিকা
প্রত্যেক পৃষ্ঠায় শিল্প, মূর্তিমতী শিখা
তোমাকে প্রথম দেখি চক্ষুহীন চোখে
যখন ত্রিশঙ্কু আমি এলোকে ওলোকে ।
গর্ভগৃহে তুমি ঢেউ, দোলালে আমাকে
সুমেরু শিখর থেকে ঘোর কুম্ভীপাকে
কালপুরুষের সখী, বাঙ্ময় স্তব্ধতা
তুমিই আমার কণ্ঠে দিয়েছিলে কথা
মৃত্যুর সপত্নী নও, সত্যের জননী
চিন্তাদ্বার খুলে দিলে, তুমি চিন্তামণি
একা-দেখা রূপ যার সহস্র প্রকার
জয় অন্ধকার, বলো, জয় অন্ধকার !

আমরা আঁধার বেচে খাই, আমরা আঁধার কিনে খাই
এর এস্টক অফুরন্ত ভাবনা কিছু নাই
তোমার কতকখানি চাই ?
লে লে বাবু ছ-আনা
যে-কোনো টুকরো ছ-আনা
চৌকো গোল তিন কোণা
চিনি মেশানো অন্ধকার, রাঙতায় মোড়া অন্ধকার
আয় রঙ্গ হাটে যাই
একটু আঁধার চেটে খাই
এক পয়সার লটারি যেমন-তেমন নিতে পারি
সবাই মিলে দিচ্ছে ছুট
অন্ধকারের হরির লুট
ভাঙা-সাঁকো নদীর ধার
জলের দরে অন্ধকার
তোমার অন্য কিছু চাই ? তুমি চোখটি বোঁজো ভাই
আমরা আঁধার বেচে খাই, আমরা আঁধার কিনে খাই !

আঁধারের সহোদরা, কতকাল দেখিনি তোমায় !

ঝড় বৃষ্টির এমন হুল্লোড়

সকাল বেলাতেই ঝড় বৃষ্টির এমন হুল্লোড়,
ইচ্ছে হলো
কিছুটা বয়েস কমিয়ে ফেলা যাক না
জট পাকানো নানা রঙের সুতো, কয়েকটা গিঁটও কি
খোলা যাবে না ?
বাগান নেই, দাঁড়াই ছয়-বাই-তিন বারান্দায়
আমার কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিচ্ছে আকাশ
গেঞ্জির নীচে ভালোবাসার কাঙাল বুক
বুক ভর্তি রোম সাদা-কালো
চোখে দিগন্তের ধুলো
ঝমঝম শব্দে অশ্বারোহীরা ছুটে যাচ্ছে নিম্ন রাস্তা দিয়ে
ইস্কুল-বাচ্চাকে উদরে চেপে বাতাস ঠেলে এগোচ্ছে
এক তরুণী মা
একটা ফুটফুটে সাদা বেড়াল এখন হয়ে গেছে রুমাল
ভিজতে ভিজতে স্বচ্ছ হলো আমার শরীর
এখন নিজেকেই খুব আদর করতে ইচ্ছে করে
জট পাকানো নানা রঙের সুতোর একটা গিঁট
অন্তত একটা গিঁট
খুলছে, খুলবে না ? এই তো খুললো

একটি পাতা খসা

গাছের ডাল ভাঙে, শুকনো পাতা ঝরে
আমিও ভাঙি রোজ, নিজের কিছু ভাঙি
ব্রিজের মুখে দেখা, আকাশে লাল মেঘ
অরুণ আভাময় বললে চোখ তুলে
এখানে কেন এত গন্ধ দেহ দেহ
এখানে কারা এত শব্দ ভুল করে
এখানে নিশ্বাসে রক্ত মাখামাখি
এ সেতু বন্ধন হঠাৎ খুলে যাবে...
মানুষ ছায়া হয়, ছায়ারা ফিরে আসে

তোমার ভুরু কাঁপে, আকাশ চিরে যায়
হাতের নীল ছাতা মাটিতে ফেলে দিলে
কুড়িয়ে নিতে এল ছায়ার প্রহরীরা
ব্রিজের নীচে নদী পাগল নদী হলো
তোমার শাড়ি ঢেউ নিমেষে বুক খোলা
অচেনা চাহনিতে বললে চলো চলো
এসব গোধূলিতে ফেরার পিছুটান
আমার অক্ষির একটি পল্লব
সহসা ছিঁড়ে গেল বাতাসে উড়ে গেল
ঘূর্ণি জলে মিশে কিছুই কিছু নয়
তবুও আমি আর আগের মতো নেই
একটি পাতা-খসা গাছ ও আমি এক...

তুমি

শ্রাবণ সন্ধ্যায় তুমি, তুমি পূর্ণ শ্রাবণ বর্ষণে
শ্রাবণ না আশ্বিনের, তুমি কার, কে তুমি, কে তুমি ?
কে তুমি আমি তা জানি, সামান্য রমণী, মেলে আছো দুই ডানা
চোখ তুমি, ঈষৎ খয়েরি মণি তুমি, গাঢ় ভ্রূপল্লব তুমি
নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম, আগুনের ভেতরে আগুন
আঙুলের ডগা থেকে শিহরন, সোনালি বুকের দোল দোল
নারী ও কিশোরী তুমি, এই খুকি, এই মহামায়া
আয় আয় সর্ষে ক্ষেতে লুকোচুরি, আয় আয় কালো জলে ডুব
ইস্কুলের পথে বাধা, ভেজা ফ্রক, ঊরুর কম্পনে, হাস্যে তুমি
মরাল গ্রীবায় তুমি, ছেঁড়া জুতো, সেফটিপিন, হা হা
রাত্রির রাস্তার মতো প্রশ্নচিহ্ন, কখনো বা চাঁদের ঝলসানি
শ্রাবণ তোমার, তুমি অশ্রু স্বেদে ভাসাও স্বদেশ !

এক জীবনে

স্বপ্ন দেখার রাত, আচমকা জেগে ওঠার রাত
কখন মিলিয়ে গেল একটা নীল সরোবরে
পদ্ম ফুলের পাপড়ি মেলছে, ভোর
মোষের পিঠে চেপে বাঁশি বাজাচ্ছে একটা শ্যামলা রঙের বাচ্চা
সূর্য ওর খিদে আনে, সূর্য সকলের খিদে আনে
রোদ্দুর সবাইকে সাজগোজ করে তৈরি হতে বলে
সবুজ শান্তির মতন ধান খেতে লকলক করছে
দুপুরবেলার উনুনের আঁচ
জল কাদায় কোন এক পলাতকের পায়ের ছাপ !
বাতাস যখন-তখন একটা যাই যাই রব তোলে
সোনাঝুরির উড়ন্ত রেণুতে যাই যাই
বকের ডানায় যাই যাই
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিতে বিশাল ঝংকারের মতন
বেজে উঠছে যাই যাই
কথা শেষ হলো না, কথা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে
বেত গাছের ডগার মতন কাঁপছে বাল্যকালের লিপ্সা
অনির্ণয় হাত জোড় করে বলছে, যাই
অন্ধকার সুড়ঙ্গ, অমীমাংসিত ধাঁধাগুলি বলছে যাই
জীবন বয়ে চলেছে নিজের নিয়মে
এক জীবনে কী আর সব হয় !

ব্যক্তিগত ইতিহাস

পিঠে এত অস্ত্রের আঘাত, ভুল করো না, প্রত্যেকবার পালাইনি
পিঠ দিয়ে আড়াল করে সামনে তো কারুকে রক্ষা করাও যায়
সামনে যে থাকে, সব সময়ই কি সম্মুখযুদ্ধ,
সামনাসামনি ভালোবাসা হয় না ?

দু'হাত বাড়ালেই কি শুধু অস্ত্র,
আঙুলের ডগায় থাকে না স্নেহ ?
আমি জামা খুলে দাঁড়াতেই তুমি পিঠে হাত দিয়ে বললে,

আঙুলের ডগায় থাকে না স্নেহ ?
আমি জামা খুলে দাঁড়াতেই তুমি পিঠে হাত দিয়ে বললে,
ইস, এত ক্ষত তোমার ?
এ যেন পাথরগোড়ার রাস্তার মতন
আমি হেসে বললাম, না, রাস্তা নয়, এ সেই অতিকায় কূর্মের পিঠ
যাতে লেখা থাকে অনেক ইতিহাস
সব ইতিহাস গৌরবের নয়
সব সময় পিঠ দিয়ে রুখে সামনের কারুকে বাঁচাইনি
এক এক সময় ভালোবাসাহীন বন্ধুত্ব দেখে দৌড়ে
বাঁচবার চেষ্টা করেছি
ভালোবাসাহীন হিংস্রতায় আমি ভয় পেয়েছি
কাপুরুষের মতন ছুটেছি এদিক ওদিক
এসো, তুমি সামনে এসো, হাত পেতে নাও
আমার আত্মসমর্পণের বীরত্ব ।

হায়, ধর্ম !

শনিবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯২
মাঠে মাঠে রবিশস্য বোনার কাজ চলছে সারাদিন
নামলো সন্ধ্যা
পাতলা অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়েছে দূরের পাহাড়
পাখিরা ফিরছে, বাতাস বইছে বিপরীত দিকে
এখন ঘরে ফেরার সময়
যাদের ঘর নেই তারাও ফেরে
ওদের ক্লান্ত পা, গলায় গুনগুনে স্বর, মাথায় জড়ানো গামছা
পাম্প হাউজে এসে টিউবওয়েলের জলে ধুয়ে নিল হাত মুখ
আঃ কী নির্মল, ঠাণ্ডা জল, ধরিত্রীর স্নেহ
জুড়িয়ে দেয় শরীর
একটা বিড়ির সুখটান, তারপর উনুন ধরাবার পালা
কয়েকজন রুটি পাকাবে, দু-একজন রাঁধবে অড়হড় ডাল,
ভেণ্ডির সবজি
আর একজন না-সাধা গলায় গাইবে গান :
"হোইহি সোই জো রাম রচি রাখা

কো করি তর্ক বঢ়াবৈ সাখা...”
যে গায় এবং যারা শোনে, তাদের এক ঝলক মনে পড়ে
সুদূর পূর্ণিয়া জেলার গ্রামের বাড়ি, ঘরওয়ালী ও
বাল-বাচ্চার মুখ
ওরা এখন পঞ্জাবের ভাড়াটে চাষী
অন্যের জমিতে এক মৌসুমের ঠিকা
দিনভর সূর্য পোড়ায় মাথা, নিঙড়ে নেয় মজ্জা
সন্ধেবেলা পেটের মধ্যেই জ্বলে উনুন, চোখ দিয়ে খাওয়া
ডাল-রুটি
তারপর খোলা আকাশের নীচে খাটিয়ায় চিৎপটাং
বিড়িতে টান দিতে দিতে ঘুমোবার আগেই দেখা দু-একটা স্বপ্ন
জীবন এর চেয়ে বেশি কিছু দাবি করেনি...
রুটি সেঁকা হয়ে গেছে, ফুটন্ত ডালে যেই দেওয়া হলো লঙ্কা
ফোড়ন
তখনই এলো দুই আগন্তুক, হাতে সাব মেশিনগান
ছদ্মবেশ ধরার কোনো চেষ্টাই নেই, চোখে নেই দ্বিধা
কেউ কারুকে চেনে না, এদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও শত্রুতা
ছিল না
সেই দুই কাল্পনিক দেশপ্রেমিক ছেলেখেলার মতন চালিয়ে দিল
গুলি
উল্টে গেল ডালের গামলা, ছড়িয়ে গেল বাসনা-নিশ্বাস লাগা
রুটি রাশি
জানলোই না কেন তারা মরছে, বুঝলোই না মৃত্যুর রূপ কেমন
পঁচিশজন সেখানেই শেষ, বাকিদের ছিন্নভিন্ন হাত-পা
এবার ছুটে আসবে শকুন-শেয়ালের পাল....

দুই আততায়ী অস্ত্রের নলে ফুঁ দিয়ে ধীর পায়ে উঠে গেল
জিপে
গ্রামের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা
কোনো বাড়িতে শ্বেত শ্মশ্রু এক বৃদ্ধ পাঠ করছেন গ্রন্থসাহেব :
“সাধো মন কা মান তিআগউ
কাম ক্রোধু সংগতি দুরজন কী তাতে অহিনিস ভাগউ...”
জমির ফসলের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সুবাতাস
এই মাত্র চাঁদ উঠে ছড়িয়ে দিল জ্যোৎস্না

তুলসীদাসের দোঁহায় রামের গুণগান করছিল যে শ্রমিকটি

তার কণ্ঠ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে
রামচন্দ্রজী, তোমার ভক্তদের তুমি রক্ষা করলে না ?
যারা অযোধ্যায় মসজিদ ভেঙে রামমন্দির বানাবার জন্য উন্মত্ত
তারাও কেউ এইসব মানুষদের বাঁচাতে আসবে না কোনোদিন
গুরু নানক, আপনি দেখলেন আপনার রক্তপিপাসু ভক্তদের
এই লীলা
গুরুজী, গুরুজী, আপনার নামে ওরা জয়ধ্বনি দিয়ে গেল ?

জম্মু থেকে এই শনিবারই একটা বাস ছাড়লো
সকাল সাড়ে আটটায়, যাবে কাঠুয়া
ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, শোনা যাচ্ছে মিশ্র কলস্বর
মায়েরা সামলাচ্ছে বাচ্চাদের, এক কিশোরীর হাতে
জিলিপির ঠোঙা
জানলায় থুতনি-রাখা তার ছোট ভাইটির চোখে বিশ্বজোড়া
বিস্ময়
আকাশ আজ প্রসন্ন নীল, উপত্যকায় উড়ছে কুসুম রেণু
যাত্রীরা কেউ ফিরছে গ্রামের বাড়িতে, একজন যাচ্ছে বিয়ে
করতে
আপন মনে বাসটা যাচ্ছে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
একটা বাঁক পেরুবার মুখেই বজ্রপাতের মতন বিস্ফোরণ
উড়ে গেল জিলিপির ঠোঙা ধরা কিশোরীর হাত
বালকটির ছিঁড়ে যাওয়া মুণ্ডুতে চোখ দুটো নেই
সন্তানকে বুকে জড়ানো জননী আর্ত চিৎকারেরও সময়
পেলেন না
কালো বোরখা পরা আর একটি রমণীর নিস্পন্দ শরীর
এই প্রথম উন্মুক্ত হলো প্রকাশ্যে
বলশালী পুরুষদেরও শেষ হয়ে গেল সব নিশ্বাস
মোট সতেরো জন, বাকিরাও মৃত্যুর অতি কাছাকাছি দগ্ধ
কেউ একজন যেন কৌতুক করে রেখে গিয়েছিল একটা
পেনসিল বোমা
সেই হত্যাকারী আল্লার সেবক, ধর্মের ঝাণ্ডা তোলার জন্য
রক্তনদী বইয়ে দিতেও দ্বিধা নেই
যারা প্রাণ দিল তারাও আল্লার সন্ততি
পাঁচ ওয়ক্ত নিত্য নামাজ পড়া দুই প্রৌঢ়ও নিস্তার পায়নি
এক মৌলবী সাহেবের ডান পা অদৃশ্য হয়ে গেছে
হায় আল্লা, হে খোদাতালা, হে খোদাতালা...

মনরোভিয়া, ডেট লাইন একত্রিশে অক্টোবর
কোথায় গেল সেই পাঁচজন আমেরিকান নান ?
আজীবন ব্রতচারিণী, তারা শরীর-মন নিবেদন করেছিল
যীশুকে
আর্তের সেবায় গিয়েছিল দেশ ছেড়ে অমন সুদূরে
কোথায় তারা ? না, হারিয়ে যায়নি, পাওয়া গেছে পাঁচটি
শরীর
লাইবেরিয়ায় যুযুধান দু পক্ষের গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে
ভূলুণ্ঠিত, বেআব্রু, রক্ত-কাদায় মাখামাখি
পরম করুণাময় যীশু কি সেই সময় চোখ বুজে ছিলেন ?

বোসনিয়া-সারবিয়াতে শুরু হচ্ছে গ্যাস যুদ্ধ
এতকালের প্রতিবেশী, শুধু ধর্মভেদের জন্য এত ঘৃণা ?
পশুরাও তো এমন ধর্মে বিশ্বাস করে না
মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের পুড়িয়ে মারছে যে বর্ণগর্বী হিন্দুরা
তারাই বাড়িতে বসে শ্লোক আওড়ায়, সব মানুষেরই মধ্যে
রয়েছেন নারায়ণ !

অন্য কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম, কলম সরছে না আমার
না, কবিতা আসছে না, ইচ্ছে করছে না ছন্দ মেলাতে
খবরের কাগজে, বেতারে, দূরদর্শনে শুধু মৃত্যুর নির্লিপ্ত ধ্বনি
অসহায় বিরক্তিতে ছটফট করছে আমার সমস্ত শরীর
ধর্মশাস্ত্রগুলির মহান বাণী টুকরো টুকরো মনে পড়ে, তাতে
আরও কষ্ট হয়
'হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর দণ্ড তব ?'
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ি, কয়েক পা গিয়েই মনে হয়
কোথায় যাচ্ছি ?
কেন উঠলাম, কেনই বা ফিরে গিয়ে বসবো টেবিলে
কবিতা হবে না, তবু লিখে যাচ্ছি এই পঙ্‌ক্তিগুলি
না, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের জন্য নয়, উন্মাদ জল্লাদদের
জন্যও নয়
শুধু আগামী শতাব্দীর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া এই সামান্য
দীর্ঘশ্বাস
মানুষকে ভালোবাসা ছাড়া মানুষের আর কোনো ধর্মই থাকবে
না
তখন, তাই না ?

একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা

একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা, তার তলাতে আমরা ন'জন
কাঁথাটার ওপরটায় বেশ নকশা কাটা, সুতোয় তোলা ফুল ফুটেছে
অনেক সুনিশ্বাসের গন্ধ
আঙুলে সূচের খোঁচায় বিন্দু বিন্দু রক্ত প্রায় দেখাই যায় না
সে সব তো পুরোনো কথা, কেই-বা আজ মনে রেখেছে
একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা, তার তলাতে আমরা ন'জন
পিঠের নীচে তেঁতুল পাতা, তাতে সব পিঠ এঁটে যায়
কিন্তু এই ছেঁড়া কাঁথায় শীত যাবে না, গা ঢাকে না
এদিক টানলে ওদিক উদলা
এ পাশের এই পুরুষটির যে গায়ে একটা গেঞ্জিও নেই
ও পাশের ওই মেয়েটির তো জ্বর এসেছে, ওর জন্য মায়া হয় না ?
শিশুটিকে শীত দিও না, ও যে আজ খায়নি কিছুই
সারাটা রাত কাঁথার টানাটানি চললে কে ঘুমোবে ?
ঘুম না হলেই ঝগড়াঝাঁটি
ঘুম না হলেই ধানের ক্ষেতে ফসল উধাও
একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা তার তলাতে আমরা ন'জন
তবে কি আর গড়বে না কেউ তাজমহল, বা
নদীর ওপর হবে না আর নতুন সেতু
গানের জলসা শূন্য থাকবে, মাছি উড়বে ?
একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা, তার তলাতে স্বপ্নও নেই ?

জলকে ভয় কি, জল তো শুধুই জল

জলকে ভয় কি, জল তো শুধুই জল
কিছু বুক-ডোবা, কোথাও পায় না পা
দিগন্ত ছোঁয়া তবুও অকূল নয়
এদিকে শ্যাওলা, ওদিকে পদ্মদাম
নীলিমা ভেঙেছে সব্‌জেটে মৃদু ঢেউয়ে
কেউ ভেসে যায়, কেউ ফিরে আসে কাছে
জলকে ভয় কি জল তো শুধুই জল
সাঁতার জানো না বাংলার যৌবন !

জলের ভেতরে আবাল্য লুকোচুরি
পথ নেই আর এরকমই পারাপার
আচমকা ঘাড় ঠুসে ধরে যদি কেউ
বুক ফেটে যায় তবু আকুপাকু শ্বাস
এক ঢোঁক খাওয়া আঁশটে ঘোলাটে জল
চরণামৃত যেমন নোংরা হয়
সাপের লেজের ছেটকানো ছিটে ফোঁটা
মিনু বৌদির অশ্রুর মতো স্বাদ।

রাত্রি ছড়ানো শান্ত গভীর জল
চাঁদের ছায়ায় হাতছানি দিয়ে ডাকে
জল নেই, রুখু মাঠে জ্বলন্ত স্রোত
শুকনো নদীর চরায় দীর্ঘশ্বাস
তবু ডাকে ঠিক শরীরের মতো ডাকে
রতি ব্যাকুলতা, ঈর্ষার বাহুপাশ
লকলকে জিভে নিজের রক্ত চাটে
ঘুমের ভেতরে ছুটে আসে হু হু বান

জলকে ভয় কি, জল তো শুধুই জল....

তোমার হাত

নিছক জ্যোতিষী বলেই তুমি লোকটার সামনে বাড়িয়ে দিলে
তোমার সাবলীল হাত
তোমার মায়াবিনী হাত
অস্পৃষ্ট, নির্জন বেলাভূমির মতন হাত, দিগন্তে লালচে আভা
বাতাসে ওড়া নিশ্বাসের মতন কত অসমাপ্ত রেখা
অসমতল অনাবিষ্কৃত দেশ
ঈষৎ কাঁপা আঙুলে দুলছে তেইশ বছরের হৃদয়
অনেক গোপন দুপুর, অনেক কান্না
তোমার হাত, অলৌকিক ইঙ্গিতময় হাত
ঐ লোকটা কী বিড়বিড় করছে তোমার হাত ছুঁয়ে
জানো না, জ্যোতিষীরা সবাই অন্ধ হয় ?

সময়ের চিহ্নগুলি সময় মানে না

চাঁপা গাছটি যুবতী না বুড়ি
চাঁপা তার বয়েস জানে না
পাহাড় ডিঙিয়ে আসা ঝরনার দুধারে কত নুড়ি
সময়ের চিহ্নগুলি সময় মানে না
বাতাস কী কথা বলে শীর্ণতোয়া নদীটির কাছে ?
আছে, আছে, আছে।

সেই বার্তা নিয়ে উড়ে যায় একটি আচাভুয়া পাখি
কোনো কোনো মানবীরই মতো তার ডানা
আকাশে তখন কালো দুরন্ত বৈশাখী
শুধু মনোলোকে দেয় হানা
চরাচর মুখ গোঁজে, পাশ ফেরে অরণ্যের ঘুম
নগরে তখন বৃষ্টি, নাগরীর নূপুর মত্ততা
ভেঙে দেয় রাত্রির নিঝুম
কথা ভাঙে, কথা ভেঙে ভেঙে হয় পাহাড়ের মতো নীরবতা.....
বাতাস তবুও কিছু বলে কানে কানে
সম্রাট অশোক তার মর্ম লিখে গেছেন পাষাণে।

ছাতিম গাছের নীচে বসে আছে যে-অন্ধ ভিখারি
অন্ধকারে মুছে যায়, ভোরের আলোর সঙ্গে জাগে
হাতের আঙুল কাঁপে, মুখে বল্মীকের ঘর বাড়ি
সে ওখানে গেড়ে আছে গৌতম বুদ্ধেরও কিছু আগে
গ্রামে গঞ্জে শুকনোস্তনী ঘোরে আম্রপালী
দিবাস্বপ্নে হানা দেয় মার
আয়ুর কৃপণ যত মুষ্টি আঁটে, খসে যায় বালি
ঘানির চাকায় ঘোরে মায়ার সংসার
বাতাস গোপনে তবু কী যে বলে খর্জুর বৃক্ষকে
মরুদেশ কাঁদে সেই শোকে।

পিতার অতৃপ্তি পুড়ে ছাই হলো গ্রামীণ আগুনে
পিতামহ রেখেছেন কাঠের সিন্দুকে দীর্ঘশ্বাস
কেউ যায় নিরুদ্দেশে, কেউ বাঁচে গোলাপের পাপড়ি গুনে গুনে
পাপোশের ধুলো চেটে যেন কার হলো স্বপ্ন নাশ।
দর্পণের উল্টো পিঠ কেউ মনে রাখে ?

ঘড়ির শিকারি চেনে কালপুরুষের মৃদু হাসি ?
মুষ্টিবদ্ধ বাঘনখে যারা বন্ধুদের গাঢ় আলিঙ্গনে ডাকে
তাদেরও উত্তরমেঘ নয় অবিনাশী
বাতাস তবুও বলে, আয়, কাছে আয়
দিন যায়, কেন বৃথা যায় !

হে সময়, একমুখী ধাবমান তীর, হে সময়
হে শতাব্দী, অলীক সীমানা
গানের মুদারা-তারা, প্রতীক্ষিত সম, শেষ নয়
আমি আছি, আমি নেই, তবু সব জানা
বাতাস কখনো ঘূর্ণি, আবার স্রোতের মতো বলে যায় হৃদয়ের কাছে
আছে, সব আছে !

নিজস্ব ভাষা

আমি এখনো কোনো পাখির ভাষা জানি না বটে, কিন্তু গাছের ভাষা জানি। এক রকম দু'রকম গাছ নয়, অনেক রকম গাছের।

সুতরাং ইস্টিকুটুম পাখিটির সঙ্গে কথা বলবার জন্য আমি দেবদারু গাছকে অনুবাদক হবার জন্য অনুরোধ করি। আমাদের সংলাপের মধ্যপথে পাশের রাধাচূড়া গাছটি হেসে ওঠে। হাসির কোনো অনুবাদ করবার দরকার হয়না, পাখিটি ও আমি একসঙ্গে বুঝি।

পাখিটি তখন জানালো, যে খবর তুমি গোপনে চেয়েছিলে, তা সর্বজনীন হয়ে গেল। এমন অনুবাদের ভাষায় কথা কইতে গিয়ে আমি আগেও অনেকবার নিরাশ হয়েছি। যেমন, প্রিয় নারীর ভাষা বোঝা কত শক্ত। তার চেয়েও শক্ত তাকে আমার ভাষা বোঝানো। সেই নারী রাজপথকে মনে করে মশারি আর দুঃখকে মনে করে সাঁতার। সেই জন্য আমি পাহাড় ও নদীর সাহায্য চেয়েছি। নদীর ভাষা নারীরা বোঝে, কিন্তু নদীমাত্রই বিশ্বাসঘাতক। নদীও নারীকে চায়। আমার কথা না জানিয়ে নদী সেই নারীকে তার নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার কথা জানায়।

পাহাড়েরও পক্ষপাতিত্ব আছে। সে এক নারীর বদলে অন্য নারীর প্রতি উপমা বদল করে। যাকে আমি মরালগ্রীবা বলেছি, তাকে সে মাধবীলতা বলে। একমাত্র বিশ্বাস করা যায় রাত্রির আকাশকে। উদার উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু প্রকৃত নিঃসঙ্গ না হলে

সেরকম আকাশ কেউ দেখতে পায়না কখনো ।

তাই বলা হয়না, বলা হয়না, কিছুই বলা হয়না !

মুহূর্তের অস্থিরতা

বারুদ রঙের এক বাড়ি, তার বারান্দায়
শীতের রোদ্দুরে
আমারই মনুষ্যদেহ ।

বাগানে অনেক ডালপালা, তার এক ডালে
কুসুম ফোটেনি
সেখানে আমার আত্মা ।

কখনো আমার হিম আত্মা এই নরদেহ
চেয়ে চেয়ে দেখে
দেখার মতন দেখা ।

কখনো লৌকিক চোখদুটি সুড়ঙ্গ দেখার
মতো সরু চোখে
আত্মার দর্শন চায় ।

কিছুই মেলে না
মুহূর্তের অস্থিরতা ঘূর্ণি বাতাসের মতো উড়ে গেলে
আয়নায় রক্তের ছাপ পড়ে
আমারই থুত্‌নির রক্ত—

সাঁজোয়া গাড়ির সামনের দিকে

সাঁজোয়া গাড়ির সামনের দিকে উত্থিত লিঙ্গের মতো
কামানের ডগায়
কেউ একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিল ।

বৃষ্টি ভেজা সেই মালার সাদা ফুল, কোনো নারীর নরম করতল ছুঁয়ে এসেছে
সেই ফুল থেকে উড়ে এলো একটা পাপড়ি, বাতাসে এক পাক ঘুরে
লাগলো সৈনিকটির হেলমেটের ঠিক নীচে, কপালে
সৈনিকটি সেটা তুলে ফেলতে গিয়ে অনুভব করলো
তার অস্ত্রগুলো হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, এত ঠাণ্ডা
তার শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে
সাব মেশিনগানের ম্যাগাজিন খালি করে সবকটা বুলেট
সে ছড়িয়ে দিল রাস্তায়
তারপর গা গরম করে নাচতে লাগলো দু'হাত তুলে...

রাস্তায় গড়িয়ে যাওয়া সেই বুলেটগুলোর একটা
কুড়িয়ে পেল এক পাঁচ বছরের বাচ্চা
দৌড়োতে দৌড়োতে বাড়ি ফিরে সে হাতের রক্তিম মুঠো খুলে
সদ্য জেগে ওঠা একটা ঝর্নার স্বরে বললো,
মা, এই দ্যাখো
মা তখন বাগানে একটা মুমূর্ষু টিউলিপ চারায় জল দিচ্ছিলেন
পাহাড়ের কুয়াশার মতন মুখ তুলে দেখলেন
ছেলের চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,
ছিঃ, এটা নোংরা, ধরতে নেই রে !
মায়ের হাতে কোন বীজাণু লাগে না, তিনি সেটা তুলে নিয়ে
ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নদীর জলে
নদীও সেটা গ্রহণ করতে চাইলো না, নদী ভুরু কোঁচকালো
মেঘের মতন ঢেউ তুলে যাচ্ছে নদী, একটা আলাদা তরঙ্গে
বুলেটটাকে গর্ভ থেকে তুলে
ফেলে দিল এক নির্জন বালিমাখা ঝোপের মধ্যে....

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে
এই পৃথিবী থেকে মুছে গেছে সমস্ত সীমান্তের কাঁটাতার
এখন অস্ত্র বলতে আছে শুধু মানুষের শরীর
এখন সব যুদ্ধই অতি ব্যক্তিগত, খুবই নিভৃত, যে
হেরে যায়, সে বেশি হাসে
সেই রকমই একটি দিনে এক যুবতী আর তার সখা ছুটে যাচ্ছে
নদীর প্রান্ত দিয়ে
একটা ঝোপের পাশে এসে তারা দেখতে পেল সেই বুলেট
যুবতীটি সেটা কৌতূহলে তুলে নিতেই বুলেটটি বলে উঠলো
এতদিনে আমার মুক্তি হলো, শোনো একটা

ফুলের মালার গল্প....
সেই ঝোপটাতে ফুটে আছে অনেক নাম-না-জানা কুসুম
গল্প শুনতে শুনতে ছেলেটি তুলতে লাগল একটির পর একটি
মেয়েটি মাথার চুল ছিঁড়ে গেঁথে নিল দুটি মালা
তারপর সমস্ত পোশাক খুলে ফেলে মালা দুটিকেই
দুলিয়ে নিল গলায়
ফুল-শরীরে নগ্ন হয়ে নামতে লাগলো নদীর জলে
নদী ছলোচ্ছল খুশিতে বললো, এসো—

আমাকে যেতে হবে

এলোমেলো বাতাসে ঘুরছে আমার না-লেখা কবিতা
সকালের ঘুম ভাঙায় আমার না-লেখা কবিতা
চায়ের টেবিলে অতিথি, তার মাথার পেছনের দেয়ালে আমার
না-লেখা কবিতা
সমস্ত কথা মিলিয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের মতন
আমি জুতোর ফিতে বাঁধছি, আমার বুকে টনটন
করছে না-লেখার দুঃখ
প্রথম লাইনটি ম্যাজিকের মতন অদৃশ্য হয়ে গেল দরজার আড়ালে
পথে পথে এত জনস্রোত, তার সঙ্গে মিশে আছে আমার
না-লেখা কবিতা
নারীর এক-পাশ ফেরা মুখ, অশ্রুত হাসি, ঝনঝন করছে
আমার না-লেখা কবিতা
বিকেলের ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ আমি ছটফট করে উঠি
এ পৃথিবীর সব কিছুর বিনিময়ে যেন যেতে হবে
আমার না-লেখা কবিতার কাছে
আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে, আমাকে
যেতে হবে !

একবার বুক খালি করে বলো

মনে করো তুমি মধ্যরাত্রি পেরিয়ে পৌঁছোলে সেই জঙ্গলে
ডাকবাংলোর দরজায় প্রকাণ্ড তালা
বারান্দায় পড়ে আছে একটা মরা কবুতর
তুমি মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলে নাচানাচি করছে অন্ধকার
ধুলো চেটে চেটে খাচ্ছে বাতাস
আর কেউ নেই, তোমার সঙ্গীর নাম নিঃসঙ্গতা
বেশ, এবারে বসো পা ঝুলিয়ে, শুরু হোক কথাবার্তা....

তোমার বয়েস কত ? চুয়াল্লিশ
আর নিঃসঙ্গতার বয়েস ?
তুমি যখন ঘুমোতে যাও, তখনও কি সে জেগে থাকে ?
আলো নেই একবিন্দু, তবু কী দেখেছো তুমি ?
তোমার খিদের মতন ভালোবাসা, না ভালোবাসার মতন
খিদে ?
লঘু যৌবনে ভুল মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গিয়ে তুমি কী চেয়েছিলে
তলোয়ার, না টর্চ ?
প্রশ্ন চিহ্নের চেয়ে তোমার বিস্ময় চিহ্নের ব্যবহার বেশি ?
তোমার পাশে বসা সঙ্গীটি তোমার কাঁধে কখনো হাত রাখে ?
তোমার তখন শরীর কেঁপে ওঠে, না নিঃশ্বাসগুলো লম্বা হয় ?
আকাশের দিকে তাকিয়ে তুমি কখনো সাদা মেঘ, সাদা মেঘ
বলে কাতর চিৎকার করেছিলে ?
অনেকগুলো সুতো ছিঁড়তে ছিঁড়তে তুমি খুলতে পেরেছো গিঁট ?
প্রথম কবে শুনেছিলে একটা অদৃশ্য রথের তীব্র ঘর্ঘর শব্দ ?
শেষ কবে তোমার চোখের জল উপহার দিয়েছিলে ?
কাকে ?
বলো, বলো, একবার বুক খালি করে বলো,
চুপ করে থেকো না !

লাল ধুলোর রাস্তা

চলন্ত ট্রেন থেকে দেখা একটা লাল ধুলোর রাস্তা
আমি ঐ রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছি, আবার আমিই ট্রেনের জানলায়

আমার দু'পায়ে পৃথিবীর রং, কাঁধে একটা পুঁটুলি
ট্রেনের কামরায় অট্টরোল, আমার পাশ দিয়ে হাঁটছে
একটি ছাগল চড়ানো বুড়ি

লাল ধুলোর রাস্তাটা কোথায় গেছে ? দু'পাশে ফসল-কাটা মাঠ
মাঝে মাঝে দু'-একটা তালগাছ, অচেনা বুনো ঝোপ
ঐ দিকের দিগন্তে লেগে আছে বড় মায়াময় জীবন
বিকেলের বাতাসে উড়ছে সম্ভাবনার নীল যবনিকা....
রাস্তাটা এখন অদৃশ্য, ট্রেন ছুটছে আরও দুরন্ত ছটফটানিতে
সকলেরই কোথাও না কোথাও পৌঁছোনোর ব্যগ্রতা
অথচ আমি হেঁটে যাচ্ছি, একটা ছাগলের বাচ্চা তুলে নিলাম বুকে
বুড়িটি ফিক করে হেসে অনাদি কালের ছবি হয়ে গেল।

কোথায় আমার দেশ

বাগানে নাম-না-জানা আগাছার উঁকিঝুঁকি, তবু মনে হয়
এক কোণে পরমার্থ মাথা গুঁজে আছে
উড়ে যায় গ্রীষ্ম-পরী, দৃশ্যের বিভায় এত আগুনের আঁচ
আমার মাটিতে চোখ, আমার মাটিতে কান
ধুলোমাখা ঠোঁট
বৃষ্টি নেই, অশ্রু নেই, আকাশ হারিয়ে গেছে কানামাছি ভিড়ে
হে মাটি, তুমি কি দেশ, তুমি কি জন্মের গল্প জানো ?
কোথায় আমার দেশ, সীমান্তের কাঁটাতারে
ছেঁড়া সুতো, ইতিহাস গড়াগড়ি যায়

বলো বলো, হে বধির, কোন্ দিকে যাবো
ছুরিকা ও ক্ষেপণাস্ত্র, মাথা নিচু করে আমি
এঁকে বেঁকে ছুটি
পৃথিবী এমন ছোট, দু'পা গেলে শেষ হয়ে যায়
কোথায় আমার দেশ, কোন্ দিকে, কোন্ অমরায়
শূন্যের গোলকধাঁধা, ধ্বংসের সহস্র আলো,
ধিক তোকে ওপেনহাইমার

মাটি এত প্রিয়, কত প্রণয়ের গন্ধ মাখা, তবু
মাটির গভীরে নেই
স্বপ্নের স্বদেশ !

এ জন্মের উপহার

কোলের ওপরে মাথা ভোরের আঙুলে মালা গাঁথা
বৃষ্টি মেঘময় দিন আবছায়া কিছুটা রঙিন
আমাকে ডেকেছো তুমি তোমার নিজস্ব বনভূমি
থেমে আছে সব কথা তোমারই রচিত নির্জনতা
সোঁদা গন্ধময় ঘাস মনে হয় সহসা প্রবাস
ঝরনা নদী নেই কাছে কুলু কুলু শব্দ তবু আছে
ওষ্ঠের অমৃতপান মালাখানি অলীকের গান
এখন পড়ে না মনে বেঁচে আছি কোন্ সন্ধিক্ষণে
নেই লোভ তৃষ্ণা ক্ষুধা মূর্তিমতী তুমিই বসুধা
এই দৃশ্য এই মায়া তোমার ছায়ার সঙ্গে ছায়া
এ জন্মের উপহার শরীরের ক্ষণিক উদ্ধার
গানখানি শেষ শুনে ঝাঁপ দেবো আবার আগুনে ।

ভুল স্টেশানে

ভুল স্টেশানে নেমে গেল মোয়াজ্জেম, তখন
মিশমিশে মাঝরাত
সে অনেক দিনের কথা, সবটা ঠিক মনে পড়ে না
স্কুল সখার সঙ্গে মান অভিমানের কোনো ব্যাপার ছিল ?
কিংবা সেই স্টেশানেই ছিল তার বাড়ি
শুধু মনে পড়ে ঘুমন্ত কামরা থেকে যেন ঝাঁপ দিয়েছিল
সে

রাত জাগা চোখে চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে অন্ধকার

দেখা আমার নেশা
দৃশ্যের চেয়েও অদৃশ্যের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টি
কখনো আবছা জোৎস্নায় সরলবর্গীয় বৃক্ষেরা
আমায় ডাকে
আদিম হ্রদ থেকে হঠাৎ যেন মাথা উঁচু করে শৈশব
দেশ-দেশান্তরে যখনই রেলগাড়িতে ঘুরি, রাত্রে ঘুম আসে না
ঠায় বসে থাকি জানলায়, অন্ধকার চলচ্চিত্র দেখায়
নিজের গালে হাত বুলাই, কনুইয়ের ফুস্কুড়িকে আদর করি
বড় একা লাগে, বড় চমৎকার লাগে
বিদেশের কোন্ অচেনা স্টেশানে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন
আমি আচমকা চেঁচিয়ে উঠি, মোয়াজ্জেম, মোয়াজ্জেম !

তিনটি প্রশ্ন

প্রণামের ছলে খুব কাছে এগিয়ে গিয়েছিল আততায়ী
প্রণামের কী যে অভারতীয় অপব্যবহার !
তারপর তিনটি বুলেট, ধ্বনি নয়, বিমূঢ় প্রতিধ্বনি
নগ্ন বক্ষ ফুঁড়ে বেরুচ্ছে রক্তের ধারা, তিনি তবু এগিয়ে গেলেন কয়েক পা
প্রার্থনা মঞ্চের দিকে, হাত জোড় করা, প্রার্থনা আর হলো না
তিনি শুধু শেষ উচ্চারণ করলেন, হে রাম
রামরাজত্বের রাম, দরিদ্রের কাল্পনিক মুক্তিদাতা, না নাথুরাম ?
ছন্নছাড়া, অতিকাতর, উদভ্রান্ত, তবু স্বাধীনতার বিবেক,
তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে ।

সবাই বলে, গান্ধীজী মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য
প্রাণ দিয়েছিলেন
ক'জন মুসলমানের বাড়িতে গান্ধীজীর ছবি টাঙানো থাকে ?
পাকিস্তান-বাংলাদেশে কেউ গান্ধীজীর নাম সচরাচর
উচ্চারণও করে না
কেউ মনে রাখেনি, দেশ বিভাগের জন্য যিনি মাতৃহীন শিশুর মতন
অশ্রু বর্ষণ করেছিলেন
হিংসার দৈত্যের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন ক্ষুদ্র শরীরে অসীম সাহসী
অহিংসার তেজ নিয়ে

কেউ মনে রাখেনি, মনে রাখলেই জাগবে পাপবোধ
তিন খণ্ড হতে চায় আরও অনেক খণ্ড, কাঁটাতারের বেড়াজালে
তিনি কোথাও নেই
ছুরিতে ভাগ করা তাঁর স্বদেশে আজ ঝলসাচ্ছে
আরও অসংখ্য ছুরি
সবরমতী আশ্রমের সামনেই গড়াচ্ছে রক্তস্রোত....

তিনটি গুলির প্রতিধ্বনি আজও বুকের মধ্যে তোলে
তিনটি প্রশ্ন
পাবে ? পাবে ? পাবে ?
সনাতন ধর্মকে বসাও সিংহাসনে, সমস্ত মানুষ মুক্তি পাবে ?
পূর্বে ও পশ্চিমে ধর্মের ধ্বজা নিয়ে গড়া হলো যে-যে রাষ্ট্র
সেখানে ইসলামের সমভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ?
কেউ অমিত ভোগের লাস্যে হা-হা করে হাসে
কেউ ক্ষুধায় ভূমিতে জিভ ঘষে
ধর্ম ব্যবসায়ীরা কেউ ধর্ম মানে না
বাবরি মসজিদে ধর্ম নেই, রাম মন্দিরে ধর্ম নেই
হিন্দু মুসলমানকে মারবে, মুসলমান হিন্দুকে মারবে
পেছনে মুণ্ডওয়ালা একদল অদ্ভুত প্রাণী খুন করবে
আর একদল পেছনে মুণ্ডওয়ালাদের
মন্দির ভাঙবে, মসজিদ ভাঙবে, আবার মন্দির ভাঙবে, আবার মসজিদ ভাঙবে
এর বস্তিতে আগুন, ওর বস্তিতে আগুন
আবার মারো, এ ওকে মারো, সে তাকে মারুক
শিশুকে কেড়ে নিক, জননীকে পোড়াক
আবার ধ্বংস, আবার আগুন, আবার মারো,
মারো, মারো, মারো
শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছোবে ?

বুকের কাছে

শুকনো ডালে দুলছে আলোয় হলুদমাখা আলোকলতা
ওর ভেতরে কিছু একটা লুকিয়ে আছে
আকাশভরা ছেলেবেলার গানগুলো কে হারিয়ে দিল পুড়িয়ে দিল

সে গান ছাড়া মানুষ বাঁচে ?
বৃষ্টি-মাদল নদী শুনছে, আর কে শুনছে, যার যেখানে যাবার সময়
দু-একবার পেছনে চাওয়া
পোশাক টানে কিসের কাঁটা
দিঙনাগেদের খেলার ভুবন ছড়িয়ে আছে শব্দ-রেখায়
ব্যস্ত পাগল বুকের কাছে।

এমন দিন, কিছু রঙিন, কিছু ভুলের জীর্ণ পাতা,
নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে দ্যাখো, দ্যাখো
ঐ তো সেই অপ্সরাদের গানের খাতা ?
ধরো ধরো, মাঝি মাল্লা দৌড়ে এসো, চক্ষে ধাঁধা
নদীতে নেই, পাখির বাসায়
ধুলোর মধ্যে সুরের কণা
সর্ষে খেতে দুলছে ভ্রমর, চিরকালের সেই মধু-চোর
সেও জানে না ফুলের মধ্যে আর একটা কী লুকিয়ে আছে।

নির্মাণ খেলা—তিন

কাঁখে গাগরী, চলেছে নাগরী, সুঠাম তনুখানি
ছন্দ মিলে ঘেরা
[এরকম লাইন মনে এলেও তা নিয়ে কবিতা লেখা চলে না। কোমরের বদলে 'কাঁখে'র মতন আর্কেইক শব্দ কখনও কখনও ব্যবহার করতে ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে 'নাগরী' ও 'তনু' যোগ করলে একেবারে বৈষ্ণব কবিতার ধাঁচ এসে যায়। কিছু কিছু বাংলা গানে তবু এখনও এ রকম চলে। আমি গান লিখি না।
কিন্তু ছবিটি ? নারী শরীরের বর্ণনা প্রত্যেক পুরুষ কবির কলমে শিক্ষানবিশির পরীক্ষার মতো। সারা জীবন ধরেই এই শিক্ষানবিশি চলে। যারা ছবি আঁকে তাদের যেমন বহু ভঙ্গিমায় নগ্ন নারী-শরীরের রেখাচিত্র রচনায় পারদর্শিতা আয়ত্ত করতে হয়। গোধুলিবেলায় নরম আলোয় একটি বা কয়েকটি রমণী কোমরে কলসি দুলিয়ে পুকুর থেকে জল আনতে যাচ্ছে, এই দৃশ্য চিরকালের। শুধু দেখার চোখ ও ভাষা বদলায়।]
কাঁখে সোনার কলস যায় নদীর কিনারে, দ্যাখো
কুচকুচে কালো এক রাধা
এত পাতলা শরীর যেন খায় না দু'বেলা, তার
বিষের লতায় চুল বাঁধা

[পেতলের কলসি খুব ঝকঝকে করে মাজলে সোনার চেয়েও উজ্জ্বল হয়। আমরা কেউ সত্যিকারের সোনার কলস দেখিনি। 'সোনার কলস' আবার অনেক সময় কোনও নারীর যৌবনের উপমা। 'কী করে বলো তো ভাঙলে তোমার সোনার কলসখানি ?' লতা দিয়ে কোনো মেয়ে চুল বাঁধে কি না তা আমি জানি না। কিন্তু 'বিষের লতায় চুল বাঁধা' এমন বিদ্যুৎ ঝলকের মতন এসে গেল যে বদলাবার প্রশ্নই ওঠে না। 'পাতলা শরীর' না 'চিকন শরীর' ?]

আজ বাতাস উধাও আজ আকাশ কঠিন, আজ
মানুষের চোখে চোখে খরা

[এ কী, এ রকম তো লিখতে চাই নি। একটি রোগা গরিব, কালো কিশোরীর নদীতে জল সইতে যাওয়ার বর্ণনা শুরু করেছিলাম, তার মধ্যে খরা টরা এসে গেল কেন ? কী ভাবে যে আসে কে জানে। এটাই তো কবিতায় ম্যাজিক। এর পর অবধারিত...]

আজ আকাশ উধাও, আজ আকাশ কঠিন, আজ
মানুষের চোখে চোখে খরা
ছেঁড়া শাড়িটি কখনো ছিল নীল বা নীলের মতো
এখন সকল রং হরা

দেখা যায় না কোমর, ওর বুকের আঁচলে ধুলো
মন ছাড়া হাঁটে পায় পায়
ঠোঁটে অতীব গোপন কথা কাকে সে
শোনাতে পারে ?
নদী তাকে ডাকে আয় আয়

[নারীর বর্ণনা কিছুই হলো না। বাকি রয়ে গেল, পরবর্তী কিংবা তারও পরবর্তী কবিতার জন্য !]

স্টিফেন হকিং-এর প্রতি

যখন তাঁর বয়েস একুশ
প্রখ্যাত কয়েকজন ডাক্তার সখেদ গাম্ভীর্যে বলেছিলেন
স্টিফেন, তুমি আর বড় জোর আড়াই বছর বাঁচবে,
আমাদের আর কিছু যে করার নেই !
অসুখের নাম মোটর নিউরোন, চিকিৎসা শাস্ত্রের অতীত
একটার পর একটা অঙ্গ পঙ্গু করে দিয়ে হৃৎপিণ্ডের গলা টিপে
মারে

তবু সেই একুশ বছরের যুবকটির মস্তিষ্ক সেই অসুখকে চ্যালেঞ্জ
জানিয়েছিল
তুমি আমার শরীরকে হারাতে পারলেও আমাকে জয় করতে
পারবে না
দ্যাখো, আমি বাঁচবো, বাঁচার সমস্ত সম্ভোগ নিয়ে বাঁচবো

একদিকে নষ্ট হতে লাগলো শরীর, অন্য দিকে তীক্ষ্ণতর
হতে লাগল মেধা
আজ স্টিফেন হকিং-এর বয়েস পঞ্চাশ বছর
এই শতাব্দীর দ্বিতীয় আইনস্টাইন
অপ্রতিদ্বন্দ্বী পদার্থবিদ, মহা বিশ্বতত্ত্বকে ধরেছেন গণিতে
চলৎ-শক্তি নেই, তবু তিনি জানেন এই পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য
এবং ধ্বংস নিয়তি
যাকে বাঁধা যায় না, সেই সময়কেও বেঁধেছেন ইতিহাসে
কথা বলতে পারেন না, আবিষ্কার করেছেন নীরব প্রেমের ভাষা
তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নারী, তিনি দিয়েছেন অনুভবের
মাধুর্য
তিনটি সন্তানের অলৌকিক পিতা হতে গিয়ে
প্রত্যেকবার বলেছেন,
অসুখ, তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি আমার জেদ
সীমাহীন করেছো

কবিদের পক্ষ থেকে এই বিজ্ঞানীকে জানাই সহমর্মিতা
এই একজন স্রষ্টা, তিনি মৃত্যুর মুখে চুনকালি দিয়ে
নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছেন অনবরত....

এক পলক অতীত

নীল রঙের গাড়িতে যে-লোকটি এই মাত্র পেরিয়ে গেল
শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়
সেই লোকটিই একদিন মাঝরাতে, ঐখানে, বাজারে রেলিং-এর সামনে
ভুঁইফোঁড় আততায়ীদের হাতে অকারণের চেয়েও অকারণে
মার খেয়ে লুটিয়ে পড়েছিল ধুলোয়

তারপর অন্তত কোটিখানেক মানুষের পা মাড়িয়ে গেছে
সেই জায়গাটা
দোকানগুলো বদলে গেছে, অন্যরকম গন্ধ
শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় রমরম করছে সন্ধেবেলা
হকারের চিৎকারে
কষা মাংসের দোকানের সামনে ভিড়, দোতলা বাসের ধোঁয়ায়
ঢেকে গেল তিনটি রমণীর মুখ
নীল গাড়ির লোকটির চোখে চশমা, হাতে সিগারেট, ওষ্ঠে
গম্ভীর রেখা
সে এক পলকের জন্য দেখলো, সেই মাঝরাতের ধুলোয়
পড়ে থাকা ছেলেটি, সারা মুখে রক্ত মাখা
জামার পকেট ছেঁড়া, এক পায়ে চটি নেই
সে পাগলের মতন খুঁজছে তার হারিয়ে যাওয়া
কলমটা
শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছিল, না পায়নি ? ঠিক মনে পড়ে না....

শিল্প নয়, তোমাকে চাই

শিল্পে গড়া আঙুল, তাই হাতছানিতে মায়া
কেন ডাকলে চন্দনের বনে হঠাৎ নিরালা সন্ধ্যায়
অনেক দূর চলে এসেছি, অনেক পথ ধাঁধা
বয়েস এমন পাকদণ্ডি যখন তখন হোঁচট
কেন ডাকলে চন্দনের বনে হঠাৎ নিরালা সন্ধ্যায়
ভুলেই গেছি কোথায় সেই যৌবনের হালকা-পাখা দিন
তোমার বুঝি এখনো সেই খেলার সাধ, নীরা ?

পাথরে গড়া মূর্তি নও, স্নিগ্ধ জ্যোতি, ছিলে অমূল তরু
আমি তখন ঘূর্ণি ঝড়ে অশান্তির রুদ্র টংকার
তবু আলিঙ্গন চেয়েছি, পাথর নয়, শিল্প নয়, নীরা
বাতাস-ধোয়া পায়ের পাতা তুমি শুধুই নারীর মধ্যে নারী
রমণী নয়, খুকি, তোমার গ্রীবায় ছিল সারাৎসার লীলা
স্পন্দ্যমান স্তনদুটিতে শুনেছি কান পেতে তোমার উন্মোচনের ধ্বনি
আমার হাত, খুনির নয়, কবির নয়, ঘামে সিক্ত হাত

এখন মাঝে মাঝেই আমার ব্যাকুলতার চোখে দেখার ভুল
রমণী নয়, পাথর, যেন বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত তুমি
ইচ্ছে করে পাথর হতে চাও কি তুমি, হৃদয়ে নয়, পায়ে
পায়ের আঙুল, জঙ্ঘা-উরু, শরীরী নয়, তোমার নয়, নীরা
যেন খোদাই শিল্প, যেন তোমার রূপ অনশ্বর হোক
কেউ চেয়েছে, কেউ তোমাকে জাদুঘরে, প্রদর্শনী শালায়
গৌরবের বন্দিঘরে রাখতে চায়, স্তুতি প্রশংসার নির্বাসনে
তুমিও তাই মেনে নিয়েছো, নরম পা পাথর হতে রাজি ?

কেন ডাকলে চন্দনের বনে হঠাৎ নিরালা সন্ধ্যায়
কোনোদিন কি ফিরবো আর, ফেরার পথে কাঁটা
যদি বা ফিরি, পুরনো সাজ পোশাক নিয়ে, ইঙ্গিতের টানে
কার জন্য ? পাথুরে পা, আধেকলীনা শিল্প কিংবা নারী
আমার নীরা, অথবা ভাস্কর্য হতে হতে ঈষৎ থামা
না না, আমি তোমাকে চাই, মূর্তি নয়, তোমাকে চাই, নীরা
স্বরূপ নিয়ে আয় রে সখী, শরীরে থাক ছটফটানি আলো !

আমার আমি

একটা ডালপালা মেলা গাছের নীচে আমি দাঁড়িয়ে
গাছটা আমাকে আমিত্ব দিচ্ছে
গুপ্ত জলপ্রপাতের মতন ফুঁড়ে উঠছে বাল্যকাল
রোদ্দুর, রোদ্দুরে চকখড়ির অসংখ্য রেখাচিত্র
গাছটা আমাকে আমিত্ব দিচ্ছে

পায়ের নোখে পথ হারা এক পিঁপড়ে কী সুন্দর
এই নিস্তব্ধতার মধ্যে শুনতে পাচ্ছি পিঁপড়েটার পদশব্দ
বাতাস এক ঝলক দেখালো বিশ্বরূপ
খসে পড়লো একটা পাতা
ঝুঁকে তুলে নিলাম, সেই পাতাটায় লেখা আমার জীবনী
পড়তে পড়তে আমি হাসি। এত অচেনা রোমাঞ্চকর
শুধু দুটো একটা কাটাকুটি। জলের দাগ
এক কণা সেই জলের ফোঁটায় জাদু দর্পণ

চোখে ঘোর লাগে, মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চায়
খুব অচেনা এক আমি।

ছেলে মেয়েদের গল্প

এক পুলিশের দুই ছেলে
একজন ক্লাশ টেনে, অন্যটি চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে
একজন জেলখাটা দেশপ্রেমিকের তিন ছেলে মেয়ে
দু'জন এখনও হাবুডুবু খাচ্ছে, একজন পাড়ার মস্তান
একজন অধ্যাপকের দুটি সন্তানই বিদেশে
এক রেল খালাসীর পাঁচটি, কে কেথায় আছে, ঠিক নেই
এক আদর্শবাদী মন্ত্রীর সবেধন নীলমণিটি
ফুলে ফেঁপে উঠছে কূট বাণিজ্যে
এক সরকারি কর্মচারীর চকচকে মেয়ের স্বয়ংবর সভায়
নেমন্তন্ন খেয়ে ধন্য ধন্য করে গেল চার হাজার
উপহারদাতা
এক চিনিকল মালিকের ছেলে রোজ মুঠো মুঠো চিনি খায়
আর প্রবন্ধ লেখে দীন দুঃখীদের নিয়ে
ফুটপাথে খেলা করে তিনটে বাচ্চা, তাদের কে মা ?
আর কে বাবা ?
এক সাহিত্যিকের ছেলে হরদম ওড়াউড়ি করে বিমানে
জনসভায় গলা ফাটাচ্ছেন যে নেতা, তাঁর ছেলেটি বোবা
এক বাড়ির ঝি পোয়াতি, কাকের বাসায় কোকিলের ছানা...

একবার চাকাটা উল্টোপাল্টা ঘুরিয়ে দাও
মাতৃসদনের সব চাক্তিগুলো এলোমেলো হয়ে গেল
মনে করো
পুলিশ ভুল করে গুলি করে মারছে নিজেরই ছেলেকে ?
ঘুঁটে কুড়ুনীর ছেলে বাণিজ্যের লাইসেন্স পেয়ে গেল
মন্ত্রীর কাছ থেকে ?
সরকারি কর্মচারির চকচকে কন্যা যার গলায় মালা দিল নিরিবিলিতে
সে আসলে রেলখালাসীর কনিষ্ঠটি
চিনি খাচ্ছে ফুটপাথের বাচ্চা আর মালিকের ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে
চাকরির

কিংবা
চড়কের মেলায় এই সব ছেলে মেয়েরাই প্রবল ফুর্তিতে
এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নেচে
চলেছে...

নিজস্ব বৃত্তে

আংটির ভেতরে চাঁদ, সেই চাঁদ এইমাত্র স্নান করে এলো
চাঁদ তো চাঁদেরই মতো, আংটিটাই কিছুটা জটিল
অনাঘ্রাত কুসুমের মতো এই অঙ্গুরীয় কোনোদিন ছোঁয়নি অঙ্গুলি
নিরালায় পড়ে থাকে, নিরালাকে নরম আলোয় ঘিরে রাখে
ঝরে পড়ে শুকনো পাতা সারারাত শিশিরের মতো শব্দ হয়
আর সব মুছে যায়, কুকুর ও মানুষের হল্লা শুধু নিজেরাই শোনে
গভীর নিশীথে জেগে আমি বনপথে যাই বৃত্তটিকে খুঁজি
সে কেবলই সরে যায়, ফুলের রেণুর মতো পড়ে থাকে
গুঁড়ো গুঁড়ো চাঁদ।

এইভাবেই প্রতিদিন

একই বাড়িতে থাকি, সবাই অচেনা
একশো বাহান্নটা দরজা, প্রত্যেকটি দরজার আড়ালে
অন্য মানুষের গল্প, এতগুলি অজ্ঞাতজীবনী
লিফ্‌ট ওঠে, লিফ্‌ট নামে, ছায়াময় মুখ
প্রশ্ন নেই। তাই কেউ উত্তরও দেয় না। হাসি দিতে হয়
অত্যন্ত নিমগ্ন হয়ে যে যার নিজের নাকের ডগা দেখে।
মাথার পেছনে থাকে আয়না, চক্ষুহীন দেখা
মাখনের মতো ঘাড়, চুড়ো বাঁধা চুল, বিদেশি সুগন্ধ মাখা নারী
এত ঘনিষ্ঠতা, এত গরম নিশ্বাস, অথচ কেউ কারুর নয়
নামহীন চোখ, পরিচয়হীন হাত, মন-ছাড়া হাসি

এইভাবেই প্রতিদিন, দিব্যি চলে যাচ্ছে
একটুও অস্বাভাবিক মনে হয় না !

এক বনমানুষ

হাত ধরতে বলো, স্বেচ্ছায় হাত ধরবে না
পা মেলাতে বলো; পা মেলাবে না
একা সরে যাবে, লাফ দিয়ে ছোট্ট এক দ্বীপে
গুটিসুটি বসে থাকবে, ইচ্ছে মতো আঙুল পোড়াবে
কাছেই রয়েছে জল, তবু খুঁড়বে বালি
তার বুকের ক্ষতটি সে কারুকে দেখাবে না ।

দামামা বাজিয়ে ডেকে আনো, অজস্র দ্বীপের
নির্জনতা তছনছ করে ধরে আনো, তখন কথা শুনবে
এক তালে পায়ে পা মিলিয়ে গাইবে গান
আকাশের দিকে তুলবে মুষ্টিবদ্ধ শপথের হাত
শরীরের ঘাম দেবে, কত শত দেওয়াল বানাবে
এমনই বাধ্য যেন ঐকতানে লীন হতে চায়
অথচ রাত্তিরে বারান্দায় দ্যাখো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে
ও সেখানে নেই, হাতের শৃঙ্খলও আর নেই
জেগে উঠছে দ্বীপ, নিজস্ব গাছপালা ঘেরা দ্বীপ
তার মধ্যে এক বনমানুষ, বুকে জন্ম ক্ষত, চুঁইয়ে পড়ে রক্ত
স্নেহ নেই, মায়া নেই, সংসার চেনে না
শিরশিরে ব্যথার মতন একাকিত্বে হাত বুলোয়
তার সমস্ত বাসনা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে যায় বাতাসে
আবার সেই বাতাসই নিঃশ্বাসে টেনে নিয়ে বলে, আঃ
সে কারুকে চেনে না, তাকে কিছুতেই চেনা যাবে না
এ পাশে শিউলি-রঙা ভোর, ও পাশে করমচা-গোধূলি
তার বুকের ক্ষতটিতে ঝলসায় অনেকগুলো শতাব্দীর ব্যর্থতা !

এত চেনা

স্টেশন থেকে বেরিয়েই মনে হলো, এখানে আগে এসেছি
পাশাপাশি দুটি ঝাউগাছ, ওদের মাঝখানের সুরেলা দূরত্ব
খয়েরি পুকুর পাড়ে একটি দীর্ঘগ্রীব বক খুব চেনা
দেড়তলা বাড়িটির পাশ দিয়ে সরু রাস্তা,
এ রকমই তো থাকার কথা ছিল

ঠিক ভেবেছিলাম, দূরে শোনা যাবে গায়ে হলুদের গান
সকাল সাড়ে ন'টার আলোয় সব কিছুই
এত পরিচিত
ছেড়ে চলে গেল ট্রেন, আর একটিও যাত্রী নেই
আকাশে এত কিসের ব্যগ্রতা ?
কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি
এত চেনা, অথচ নাম জানি না, এই
জায়গাটা কোথায়
যেখানে আমিই একমাত্র যাত্রী ?

চলে যাবো ?

শুধু শুধু কত যে সময় নষ্ট, সুন্দরকে দেখি না

গরম ধুলোয় হাওয়ার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি
দু' পাশ দিয়ে কারা বাড়িয়ে দিচ্ছে অতৃপ্ত হাত
একটা পাথরের ঘুমভাঙা না দেখেই চলে যাবো ?
পশুরা মাটির দিকে চেয়ে চলে, মানুষই বা ক'বার তাকায়
আকাশের দিকে ?

পুকুরের জলে পড়লো ঢিল, কী অপূর্ব নিখুঁত বৃত্ত
একটার পর একটা
কোথাও থুতনিতে আঙুল দিয়ে ঘাটে বসে আছে জলকন্যা
তার স্তনবৃন্তে হিরেকুচি, জ্যোৎস্নামাখা চুল
আমি শুধু ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে শুনতে চলে যাবো ?